দোমোহনিতে দুঃস্বপ্ন

ছবি : শুভদীপ শর্মা

লক্ষ্মীবারের আতঙ্ক তাড়া করছে অর্চনাদের

অর্ঘ্য বিশ্বাস

ময়নাগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে চোখ বুজলে এখনও আতঙ্কের ছবিটা যেন দেখতে পাচ্ছেন অর্চনা। আচমকা বিকট শব্দ এখনও যেন কানে তালা ধরিয়ে দিচ্ছে। মাত্র ২৪ ঘণ্টা আগে ওই শব্দ কানে আসার পরেই তো এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল সবকিছু।

আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে যাঁর নামার কথা ছিল নিউ কোচবিহার স্টেশনে, তিনি শুক্রবার শুয়ে আছেন ময়নাগুড়ি হাসপাতালে। কোলের কাছে সন্তানও শুয়ে আছে বটে। কিন্তু কিছুতেই ভুলতে পারছেন না, বৃহস্পতিবার ট্রেনের হেলে যাওয়া কামরায় তাঁর কাছ থেকে কিছুটা দূরে পড়ে অনেকক্ষণ ছিটকে পড়েছিল তাঁর ছেলে। তার মাথা ফেটে তখন রক্ত ঝরেই চলেছিল।

জলপাইগুড়ি জেলার দোমোহনির কাছে বৃহস্পতিবার দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিকানের–গুয়াহাটি ট্রেনের যাত্রী ছিলেন অর্চনা রায়। স্বামী ও দুই সন্তানের সঙ্গে জয়পুর থেকে কোচবিহার শহরের বাড়ি ফিরছিলেন। নিউ কোচবিহার স্টেশন ছিল আর ঘণ্টা দেড়েকের পথ। পরিবারের সবাই তখন গল্পে মশগুল। বছর দশেকের আহত ছেলের পাশে শুয়ে অর্চনার সেই স্মৃতিই বারবার মনে পড়ছে।

আহত মা ও সন্তান। বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় চার যুবক।

শুক্রবার তিনি বললেন, 'হঠাৎ বিস্ফোরণের মতো আওয়াজ আর প্রবল ঝাঁকুনি। মুহূর্তের জন্য চোখে অন্ধকার দেখলাম। সংবিৎ ফিরতে দেখি আমার ছেলে দীপ পড়ে রয়েছে কিছুটা দূরে। মাথা থেকে গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে।' উদ্ধারকারী দল রাতেই তাঁদের

দুর্ঘটনার স্মৃতি টাটকা/১

এনে ভর্তি করে দিয়েছিল ময়নাগুড়ি হাসপাতালে। তাঁর ও ছেলের আঘাত ভালোরকমের। তবে বরাতজোরে রক্ষা পেয়েছেন স্বামী উত্তম রায় ও মেয়ে দিয়া।

অর্চনার মতো নিউ কোচবিহারে নামার কথা ছিল পূর্ণিমা বর্মনের। তিনিও রাজস্থান থেকেই ফিরছিলেন। দুর্ঘটনায় তাঁর আঘাত বেশ গুরুতর। জখম তাঁর বছর দুয়েকের মেয়েও। দুজনেই ময়নাগুড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তবে তাঁর স্বামী প্রশান্ত ও পরিবারের অন্যান্যরা সুস্থ আছেন বলে পূর্ণিমা জানালেন।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ময়নাগুড়ির দোমোহনিতে বিকানের–গুয়াহাটি এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হলে মৃত্যু হয় নয়জনের, আহত হন ৩৬ জন। অর্চনা, পূর্ণিমার মতো আহতদের অনেকে ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ির হাসপাতাল এবং শিলিগুড়ির কাছে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার রাতেই ময়নাগুড়ি চলে এসেছিলেন অর্চনার দেওর গৌতম। তাঁর কথায়, 'সন্ধ্যা নাগাদ ফোনে দুর্ঘটনার খবর পাই। সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছি। ওরা যে সবাই জীবিত রয়েছে, এটাই অনেক।' শুক্রবার ময়নাগুড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন ৯ জন। এঁদের মধ্যে বিশ্বজিৎ মণ্ডল, কিশোর বর্মন, প্রসেনজিৎ বর্মন ও জয়নাথ বর্মনকে বিকেলে ছুটি দেওয়া হয়।

ময়নাগুড়ির ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক লাকি দেওয়ান জানান, শারীরিক পরীক্ষার পরে শুক্রবার চারজনকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। এখনও শিশুসহ পাঁচজন ময়নাগুড়ি হাসপাতালে ভর্তি আছেন। তাঁদের অবস্থা স্থিতিশীল। ছুটি পেয়ে যাঁরা বাড়ি ফিরলেন, তাঁরা সবাই রাজস্থানের জয়পুরে এক বেসরকারি পাইপ কারখানায় চাকরি করতেন। ছুটি নিয়ে দীর্ঘদিন পরে বাড়ি ফিরছিলেন। এঁদেরই একজন বিশ্বজিতের বক্তব্য, 'করোনার জন্য চার বন্ধু একসঙ্গে বাড়ি ফিরছিলাম। বরাতজোরে বেঁচে গেলাম। বৃহস্পতিবারের কথা এজন্মে ভুলব না।'

দুর্ঘটনাস্থলে ভিড় কৌতূহলীদের হয়ে গেল সেলফি জোন

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : দুর্ঘটনার পর বৃহস্পতিবার গভীর রাত পর্যন্ত উদ্ধারকাজ চালিয়েছেন উদ্ধারকারীরা। তারপর রেললাইন থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেন সরিয়ে ওই পথে রেল চালানোর জন্য প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। রাতের অন্ধকার কাটিয়ে দিন যত গড়িয়েছে, বেড়েছে কাজের গতি। সেই সঙ্গে বেড়েছে মানুষের ভিড়। দুর্ঘটনার দিন গ্রামের মানুষ ভিড় জমিয়েছিলেন উদ্ধারকার্যে সাহায্য করতে। এদিন ঠিক তার উলটো চিত্র। শুধুমাত্র কৌতূহলবশত করোনার বিধিনিষেধ উড়িয়ে কাতারে কাতারে মানুষ দুর্ঘটনাস্থলে ভিড় জমিয়েছেন। বেশিরভাগ মানুষের মুখে কোনও মাস্ক ছিল না।

দুর্ঘটনাস্থলের একপাশে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও জেলা প্রশাসনের তরফে রেলের কর্মী ও উদ্ধারকর্মীদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেখানে বহু দুর্ঘটনা দেখতে আসা মানুষও খাবার খেয়েছেন। এদিকে, নিজেদের সাধ্যমতো দ্রুত রেললাইন মেরামতের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন রেলকর্মীরা। এরই মাঝে রেলমন্ত্রী থেকে শুরু করে জেলা প্রশাসনের বহু আধিকারিক বারবার দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ঘটনাস্থল পরিদর্শনে এসে প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্থানীয়রাই তাঁকে প্রথমে অ্যাম্বুল্যান্সে ও পরে তাঁর নিজের গাড়ি করে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠান। পরে অবশ্য জানা যায়, তিনি সুস্থ রয়েছেন।

স্থানীয় প্রবীণ গ্রামবাসী দীনেশ বিশ্বাস, সুবোধ রায়, জগদীশ বসুনিয়ারা জানান, নয়ের দশকে গ্রামের প্রায় একই স্থানে একটি ট্রেন দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল। তবে সেই সময়ের ঘটনাকে ছাপিয়ে গিয়েছে এবারের দুর্ঘটনা। গ্রামের বাসিন্দারা জানান, সারা দেশে ও রাজ্যে করোনার সংক্রমণ বাড়ছে। এরই মাঝে গ্রামে এত মানুষের সমাগম তাঁদের চিন্তায় ফেলেছে।

বৃহস্পতিবারের পর এদিনও কৌতূহলবশত দুর্ঘটনাস্থলে আসেন ময়নাগুড়ির কামারপাড়ার গৃহবধূ অর্চনা দাস। তাঁর কথায়, 'রাতের অন্ধকারে তেমনভাবে দুর্ঘটনাস্থল দেখা হয়ে ওঠেনি। তাই এদিন ফের ঘটনাস্থলে এসেছি।' শুধু ময়নাগুড়ি নয়, ধূপগুড়ি, মালবাজার, ক্রান্তি, জলপাইগুড়ি, এমনকি শিলিগুড়ি থেকেও বহু মানুষ সেখানে ভিড় জমান। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, দুর্ঘটনাস্থলে যাওয়ার কাঁচা রাস্তায় ছোট গাড়ি ও মোটর সাইকেলের ভিড় জমে ওই পথে যান চলাচল প্রায় বন্ধ হতে বসে। পরে পুলিশি তৎপরতায় যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

এদিকে, বড় বড় যন্ত্রাংশ দিয়ে রেলের দুর্ঘটনাগ্রস্ত কামরা সরানোর কাজ মুঠোফোনে বন্দি করতে দেখা যায় বহু উৎসাহী মানুষকে। কাজ স্বাভাবিক রাখতে একসময় তাঁদের সরাতে প্রশাসনকে হিমসিম খেতে হয়। মাইকে সকলকে দূরে থাকতে বলা হয়।

এদিন সকালে এনএফ রেলের জেনারেল ম্যানেজার আনশুল গুপ্তা জানিয়েছিলেন, দুপুর একটার মধ্যে রেললাইন মেরামত করে ফেলা হবে। তবে সকাল থেকে সন্ধ্যা গড়ালেও ভিড় কমার কোনও লক্ষণ দেখা যায়নি। সেইসঙ্গে ২৪ ঘণ্টা পেরিয়ে যাওয়ার পরও ওই রেলপথে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়নি।

কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রাণ বাঁচানোর লড়াই

অর্ঘ্য বিশ্বাস

ময়নাগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : ঘড়ির কাঁটায় তখন সন্ধ্যা প্রায় ছয়টা। বৃহস্পতিবার ময়নাগুড়ি হাসপাতালপাড়ায় তখন শুধুমাত্র অ্যাম্বুল্যান্সের শব্দ। আশপাশের গলিগুলিতে অল্প অল্প করে ভিড় জমতে শুরু করেছে। একের পর এক অ্যাম্বুল্যান্স এসে ঢুকছে হাসপাতালের ভিতরে। নামানো হচ্ছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিকানের–গুয়াহাটি এক্সপ্রেসের আহত যাত্রীদের। কারও মাথা ফেটে বেরোচ্ছে রক্ত। কারও বা হাত থেকে। আবার কেউ শুয়ে আর্তনাদ করছেন। আহতদের এই অবস্থায় দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলেন হাসপাতালের আশপাশের বাসিন্দারা। অ্যাম্বুল্যান্স থেকে আহতদের বেড পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া বা বেড থেকে অ্যাম্বুল্যান্সে তুলে দেওয়া– স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করলেন তাঁরা। পর্যাপ্ত স্ট্রেচার না থাকায় চাদর ও কম্বলে করেই আহতদের তুলে নিয়ে গেলেন হাসপাতালের ভিতরে।

জয় অধিকারী, তন্ময় পঞ্চানন, গৌতম ধর– সকলেই হাসপাতালপাড়ার বাসিন্দা। পেশায় একটি বেসরকারি সংস্থার কর্মী জয় অধিকারী জানালেন, মানুষ তো মানুষের জন্যই কাজ করবেই। ময়নাগুড়িতে এত বড় দুর্ঘটনা এর আগে কখনও হয়নি। এই ধরনের ঘটনা শোনার পরে সন্ধ্যা থেকেই তাঁরা হাসপাতালে উপস্থিত ছিলেন। আহতদের অনেকেই বাড়ি থেকে অনেক দূরে, তাই তাঁদের সহযোগিতা করা দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে।

এরই মাঝে হাসপাতালে পৌঁছাল আরেকটি অ্যাম্বুল্যান্স। সেখান থেকে নামানো হল বছর ছয়ের এক বালিকার নিথর দেহ। তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যেতেই চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করলেন। বলতে গিয়ে চোখ ভিজে উঠল সেই চিকিৎসকেরও। হাসপাতালপাড়ার পাশাপাশি ময়নাগুড়ির অন্য এলাকার বাসিন্দা ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাও রাতভর আহতদের সাহায্য করেছেন। রক্ত দিতে এগিয়ে এসেছেন বহু মানুষ। শেষপর্যন্ত মানুষ তো মানুষেরই জন্য।

কত মানুষের কত শখের জিনিস। শুক্রবার সকালে অকুস্থলে। ছবি : সপ্তর্ষি সরকার

সেই ভয়ানক দৃশ্য ভুলতে পারছেন না মনোরঞ্জনরা

> দুর্ঘটনার পর অনেকে কামরা থেকে বেরোতে পারলেও আগুন লাগার ভয়ে জিনিসপত্র নিতে চাইছিলেন না। আমি অনেকের জিনিস বাইরে বের করে দিই।
>
> —মনোরঞ্জন বিশ্বাস

প্রণব সূত্রধর ও গৌতম সরকার

আলিপুরদুয়ার ও কামাখ্যাগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : রেল দুর্ঘটনার পরের দিনও আতঙ্ক কাটেনি আলিপুরদুয়ার শহরের মাড়োয়ারিপট্টি এলাকার বাসিন্দা নেহা লাহোটির। আড়াই বছরের শিশুকন্যাকে নিয়ে কাটিহার থেকে বিকানের–গুয়াহাটি এক্সপ্রেসের বি–৪ কামরায় উঠেছিলেন নেহা। দোমোহনির কাছাকাছি আসতেই ট্রেনের ঝাঁকুনিতে হকচকিয়ে যান তিনি। ওপরের বার্থ থেকে একজন যাত্রী পড়েও যান। কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই কামরাজুড়ে শুরু হয়ে যায় চিৎকার–আর্তনাদ। একটু ধাতস্থ হয়েই স্বামী অনিল লাহোটিকে ফোন করেন নেহা। অন্য যাত্রীদের সহযোগিতায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেন থেকে মেয়েকে নিয়ে নামেন। ময়নাগুড়িতে এক আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নেন। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় সেখানে পৌঁছান অনিল। এরপর রাতে আলিপুরদুয়ারে ফিরে আসেন নেহা। ঘটনার একদিন পরেও দুর্ঘটনার মুহূর্তের কথা ভাবলে শিউরে উঠছেন তিনি। নেহার কথায়, 'আমার হাতে অল্প চোট লেগেছে। কিন্তু যিনি ওপরের বার্থ থেকে পড়ে গিয়েছেন, তাঁর ভালোই আঘাত লেগেছে। সেই ভয়ানক দৃশ্য ভোলা যাচ্ছে না। মেয়েও খুব ভয় পেয়েছে।'

শামুকতলার বাসিন্দা মনোরঞ্জন বিশ্বাস বিএসএফে কর্মরত। জয়সলমেরের কর্মস্থল থেকে তিনি বাড়ি ফিরছিলেন, ছিলেন এস–২ কামরায়। সেনায় কাজ করার সুবাদে অনেকরকম বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে মনোরঞ্জনবাবুকে। তিনিও ঘটনার আকস্মিকতা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তাঁর বক্তব্য, 'কয়েকমাস আগেই জয়সলমেরে পোস্টিং হয়েছে। বেশিরভাগ যাত্রী জয়পুর থেকে বাড়ি

দুর্ঘটনার স্মৃতি টাটকা/২

ফিরছিলেন। কোচবিহারের যাত্রীর সংখ্যাই বেশি ছিল, তার মধ্যে আবার মহিলা যাত্রীর সংখ্যা বেশি। দুর্ঘটনার পর অনেকে কামরা থেকে বেরোতে পারলেও আগুন লাগার ভয়ে জিনিসপত্র নিতে চাইছিলেন না। আমি অনেকের জিনিস বাইরে বের করে দিই।' মনোরঞ্জনবাবুর সংযোজন, 'সেনাবাহিনীতে কাজ করার জন্য আমাদের কিছু অভিজ্ঞতা থাকে। কিন্তু এমন দুর্ঘটনা জীবনে প্রথম দেখলাম। তবে পরিবারের লোকজন গাড়ি নিয়ে গেলে রাতেই বাড়িতে ফিরে আসি।'

মায়ের অসুস্থতার কথা শুনে জয়পুর থেকে ট্রেনে চেপেছিলেন আলিপুরদুয়ারের উত্তর চিকলিগুড়ির বাসিন্দা সুব্রত সেন। বছর তেত্রিশের সুব্রত গত লকডাউনে কাজ হারিয়ে রাজস্থানে পাড়ি দিয়েছিলেন। জয়পুরে একটি প্লাইউড কারখানায় কাজ করেন তিনি। দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেনের ইঞ্জিনের থেকে ঠিক দুটি কামরার পরেই ছিল সুব্রতর কামরা।

সুব্রত জানান, তিস্তা পার হয়ে একটু এগোতেই প্রচণ্ড শব্দ হয়, তাঁর সঙ্গে ঝাঁকুনি। সিট থেকে পড়ে যান। সুব্রতর ওপর বেশ কয়েকজন পড়ে যান। কোনওমতে উঠে দেখেন লাইনের পাশে উলটে পড়ে রয়েছে কামরা। বুকে ও পায়ে গুরুতর চোট নিয়েই বাইরে বেরোন তিনি। দুর্ঘটনাস্থল থেকে টোটোয় ময়নাগুড়ি বাসস্ট্যান্ডে আসেন। আলিপুরদুয়ারগামী বাসেও চেপে বসেন। বাস থেকে নামার পর আর চলার সামর্থ্য ছিল না সুব্রতর। রাস্তার পাশে বসে যন্ত্রণায় কাতরাতে দেখে কয়েকজন তাঁর দিকে এগিয়ে যান। ঘটনার কথা জানার পর সুব্রতকে নিয়ে যাওয়া হয় জেলা হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসার পর আপাতত বাড়ি ফিরেছেন সুব্রত। কিন্তু ঘটনার ভয়াবহতার কথা মনে পড়লেই চোখ বুজছেন তিনি।

মেয়ের বিয়ের গয়না ফেরান, কাতর আর্জি

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : 'মেয়ের বিয়ের সোনার গয়নাগুলো ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন'–রেলমন্ত্রীকে হাসপাতালে পেয়ে করজোড়ে এই আবেদন করে কান্নায় ভেঙে পড়লেন রেলযাত্রী নরেশ বর্মন। যে ব্যাগে সোনার গয়না, টাকা এবং প্রয়োজনীয় নথি ছিল, সেটি দুর্ঘটনার পর আর খুঁজে পাননি নরেশবাবু। এদিন যখন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণ দুর্ঘটনায় আহতদের দেখতে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে আসেন, তখনই মন্ত্রীর কাছে কাতর আবেদন জানান তিনি। নরেশবাবুর মুখ থেকে তাঁর অসহায় পরিস্থিতির কথা শুনে নিজের দপ্তরের আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন মন্ত্রী।

কোচবিহারের নয়ারহাটের বাসিন্দা নরেশ বর্মন। গত কয়েক বছর ধরেই জয়পুরে রাজমিস্ত্রির কাজ করেন তিনি। সেখানেই স্ত্রী–কন্যাকে নিয়ে থাকতেন। আগামী ফেব্রুয়ারি মাসেই মেয়ে পিংকির বিয়ে। পাত্র রবি অধিকারী কোচবিহারের বাসিন্দা হলেও তিনিও পেশার তাগিদে জয়পুরেই থাকেন। বিয়ে উপলক্ষ্যে হবু শ্বশুরবাড়ির লোকদের সঙ্গে রবিও জয়পুর থেকে একই ট্রেনে কোচবিহার ফিরছিলেন। ঘটনাচক্রে ট্রেনের টিকিট আলাদা কামরায় থাকায় হবু জামাই রবি ছিলেন ট্রেনের প্রায় শেষ প্রান্তে এস–৩ কম্পার্টমেন্টে। অন্যদিকে, সপরিবারে নরেশবাবু এস–১৩ কম্পার্টমেন্টে ছিলেন। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন নরেশবাবুর মেয়ে পিংকি বর্মন। তাঁর মাথায় চোট লেগেছে। বর্তমানে তিনি জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ওই কম্পার্টমেন্টে ছিলেন নরেশবাবুর বেশ কয়েকজন নিকটাত্মীয়। যাঁদের মধ্যে দুর্ঘটনায় প্রাণ গিয়েছে সম্রাট কার্জি (১৭) নামে তাঁর এক নিকটাত্মীয়ের।

এদিন হাসপাতালে দুর্ঘটনার অভিজ্ঞতার কথা জানাতে গিয়ে গলার স্বর শুকিয়ে আসছিল নরেশবাবুর। তিনি জানালেন, জয়পুর থেকে হবু জামাই সহ তাঁদের নিকটাত্মীয়দের ২৩ জনের একটি দল কোচবিহার ফিরছিল। বেশ কয়েকজন ছিলেন হবু জামাই রবির কম্পার্টমেন্টে এবং বাকিরা সকলেই ছিলেন এস–১৩ কম্পার্টমেন্টে। ট্রেনটি নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন ছাড়ার পরেই প্রত্যেকের মধ্যে বাড়ি ফেরার আনন্দ আরও বেশি করে জেগে ওঠে। নামার প্রস্তুতি শুরু করে দেন সকলে। আচমকাই বিকট শব্দ, তারপর পরপর দু'বার জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে কম্পার্টমেন্টটি লাইন থেকে অনেক দূরে ছিটকে পড়ছে দেখতে পেয়ে সবাই চিৎকার করে ওঠেন। নিমেষের মধ্যে ধুলোয় ভরে যায় এলাকা। উলটে যাওয়া কম্পার্টমেন্ট থেকে নিজেরা বের হতে পারলেও সেখানেই থেকে যায় তাঁদের বেশিরভাগ ব্যাগ–সুটকেস। যার একটির মধ্যে ছিল উপার্জনের সর্বস্ব দিয়ে তৈরি করা মেয়ের বিয়ের গয়না। সেইসঙ্গে ওই একই ব্যাগে ছিল উপার্জনের সমস্ত টাকাপয়সা। যা ফিরে পেতেই এদিন মন্ত্রীর কাছে করজোড়ে আবেদন জানিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন নরেশবাবু।

মন্ত্রীর কাছে কাতর আবেদন রেলযাত্রী নরেশ বর্মনের। জলপাইগুড়ি হাসপাতালে।